শিক্ষাব্যবস্থা বিনির্মাণে কিছু সুপারিশ

ড. মাহরুফ চৌধুরী, ড. তানভীর আহমেদ, ড. মো. সাজেদুর রহমান ও ড. এ টি এম শাফিউল আলম

২১ আগস্ট, ২০২৪
০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ছাত্র-জনতার সম্মিলিত গণ-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক ফসল স্বৈরাচারের পতন। বহু প্রাণের বিনিময়ে জাতি অর্জন করেছে দ্বিতীয় বিজয়। এই বিজয়ের ফসল ঘরে তুলতে আমাদের এখনো অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। মূল রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো থেকে আমরা এখনো স্বৈরতন্ত্রের শিকড় উচ্ছেদ করতে পারিনি।

স্বৈরাচারকে হটিয়ে শিক্ষার্থীদের এই বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন দেশের সর্বস্তরের মানুষকে যে আনন্দ আর মুক্তির আস্বাদ দিয়েছে, তাকে ফলপ্রসূ করতে আমাদের প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর ব্যাপক বিনির্মাণ। নতুন প্রজন্ম সেই বিনির্মাণের দাবি তুলেছে এবং হাত লাগিয়েছে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মকাণ্ডে। কাজের মাধ্যমেই তারা দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং চালিয়ে যাচ্ছে। সেটিও প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র।

মানব উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষা রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। প্রকৃতপক্ষে একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নে ফলপ্রসূ শিক্ষার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। বৈষম্যমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসেবে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর মধ্যে দিয়ে আমূল পরিবর্তন করা।

বিজয়ের এমনই এক মাহেন্দ্র সময়ে আমাদের উচিত এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদের বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। এই বিনির্মাণ প্রক্রিয়ায় আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে ছাত্র-জনতার এই বিপ্লবের মৌলিক সংঘবদ্ধতার শক্তি ‘বৈষম্য’ ও ‘স্বৈরাচার’ বিরোধী অবস্থান। সেটিকে অঙ্গীকার করেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে আমরা একটি বৈষম্যহীন ও স্বৈরাচারমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

এ জন্য বিদ্যমান শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের নজর দিতে হবে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো, একটি সক্ষম ও সচল শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যার মধ্যে কোনো রকমের সিস্টেমিক বৈষম্য থাকবে না।

নিচে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনের জন্য কিছু সুপারিশ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য তুলে ধরা হলো। এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান নানা সমস্যার সমাধান করা এখন সময়ের দাবি।

১. শিক্ষা প্রশাসনের পুনর্গঠন অত্যাবশ্যক। আমাদের সরকারব্যবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটিমাত্র মন্ত্রণালয়ই যথেষ্ট। শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যাঁরা জড়িত, তাঁরা জানেন যে আমাদের দুটি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের দুমুখো হরিণের মতো আচরণের ফলে প্রায়ই শিক্ষাব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠেছে। শিক্ষাকে একটি সেক্টর হিসেবে বিবেচনা করে সেই সেক্টরের মাঝে কয়েকটি সাবসেক্টর থাকতে পারে। যেমন—শিশু-কিশোর ও প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা, বয়স্ক, অব্যাহত ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য একজন মন্ত্রী এবং প্রতিটি সাবসেক্টরের জন্য একজন করে প্রতিমন্ত্রী থাকতে পারেন। অথবা একাধিক সাবসেক্টরের জন্যও একজন প্রতিমন্ত্রী থাকতে পারেন। সেটি প্রয়োজন ও সক্ষমতার ভিত্তিতে সরকারই সিদ্ধান্ত নেবে।

তা ছাড়া শিক্ষা পরিকল্পনার বিশেষায়িত বিষয়গুলোতে (যেমন—শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) প্রশাসনের অভিভাবকসুলভ প্রভাবও দূর করতে হবে। শিক্ষার পরিকল্পনায় শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ যেখানে প্রাধান্য পাওয়ার কথা, সেখানে প্রায়ই প্রশাসনিক ব্যক্তিবর্গের প্রভাব দেখা যায়। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষা প্রশাসনের মূল কাজ হচ্ছে, শিক্ষা পরিকল্পনা ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা। কাজেই প্রশাসন শিক্ষা পরিকল্পনার মতো একটি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে ছড়ি না ঘুরিয়ে প্রশাসনের মূল কাজ হওয়া উচিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করা আবশ্যক। প্রয়োজনে আইন করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নামে বেনামে দলীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষক নিয়োগ প্রভৃতির

ক্ষেত্রে দলীয়করণ প্রতিরোধ করতে হবে। আর শিক্ষার পরিবেশ ও গুণগত মান নিশ্চিত করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত করতেই হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের রাজনীতি যদি করতেই হয়, সেটি সীমাবদ্ধ থাকতে হবে নিজেদের অধিকার আদায়, শিক্ষার পরিবেশ ও মান উন্নয়ন এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে। মানুষ রাজনীতি সচেতন হিসেবে প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে যেকোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পেশাজীবীর কোনো দলীয় পরিচয় থাকতে পারে না। তাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারীসহ কোনো পেশাজীবী নামে-বেনামে দলীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন না। যদি তাঁরা সেটি করেন, তবে তাঁদের নিজ নিজ পদ ও পেশা ত্যাগ করে সেটি করতে হবে।

এখানে বলে রাখা জরুরি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধের নানা কলাকৌশল অবলম্বন করলেও শিক্ষার্থীদের রাজনৈতিক সাক্ষরতাসহ নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। একুশ শতকের এই নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আমাদের প্রমাণ দেখিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়। রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি থেকে বেরিয়ে স্বৈরাচারী শাসনের মুখে কিভাবে চপেটাঘাত করতে হয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের এই উদাহরণ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলার বিকল্প নেই। রাজনৈতিক সাক্ষরতার মধ্যে কেবল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নেতৃত্বই নয়, বরং সাধারণ নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহি শেখানো দরকার। এতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেমন দেশ ও তাদের আশপাশের পরিবেশের প্রতি যত্নশীল হবে, তেমনি দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দক্ষতা অর্জন করবে। এ জন্য শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচিতে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা শক্তিশালী করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রসংসদের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়মিত রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। তবে এটি নিশ্চত করতে হবে যে সেখানে যেন দলীয় লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা না হয় এবং ছাত্রদের অন্য কেউ নিজেদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে।

৩. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও জ্ঞান বিকাশে বিকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী জানা ও শেখার সুযোগ তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে। শিক্ষাকে শুধু শ্রেণিকক্ষকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রমের গণ্ডিতে বদ্ধ না করে বিকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদের সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ করে দিতে হবে।

৪. শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সংস্কার করা প্রয়োজন। সর্বস্তরে শিক্ষক নিয়োগে শুধু মৌখিক পরীক্ষা কিংবা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ চূড়ান্ত করা যাবে না। শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

নিয়োগপ্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে নিয়োগ পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণের পর সাময়িক নিয়োগ প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় ধাপে সাময়িক নিয়োগের সময় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান, শিক্ষার্থীর সঙ্গে আচার-ব্যবহার ও তাদের সহায়তা করার বিষয়াদি মূল্যায়নের ভিত্তিতে চূড়ান্ত নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৫. শিক্ষাব্যবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণ ও সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশে প্রচলিত নানামুখী শিক্ষাধারা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কারণে যে বৈষম্য বা শ্রেণীকরণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেটি বন্ধ করতে হবে। সাধারণ ধারা, ইংরেজি মাধ্যম ধারা ও মাদরাসা ধারার শিক্ষার্থীর প্রতি যেসব পক্ষপাতিত্ব বা বৈরিতা রয়েছে, সেগুলো বন্ধ করতে হবে। যেকোনো ধারায় বা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। বিদ্যমান ধারা বা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে যদি শিক্ষার গুণগত মানে অসমতা থাকে কিংবা জ্ঞান ও দক্ষতার ক্ষেত্রে কোনো রকমের শূন্যতা থাকে, সেসব পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ছাত্রজীবনে কাজের অভিজ্ঞতা ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যুক্ত করা একাধিক কারণে অত্যন্ত জরুরি। ঐতিহাসিকভাবে জাতীয় সংকটকালীন সময়ে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অপরিহার্য করে তোলে। এই অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখবে এবং তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন, অর্থ উপার্জন এবং জীবনের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। তা ছাড়া এটি তাদের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা বিকাশে, দায়িত্ববোধ জাগ্রত করতে এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সহায়ক হবে, যা তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করবে। যে শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এ ধরনের কার্যক্রমে জড়িত থাকবে, তাদের সেই অভিজ্ঞতার জন্য বিশেষ সনদ প্রদান করা যেতে পারে। যখন একই ধরনের যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক প্রার্থী থাকবে, তখন এমন সনদধারী প্রার্থীকে চাকরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে।

৭. গবেষণালব্ধ প্রমাণের ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আমরা অতীতে লক্ষ করেছি, যেকোনো রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এসে শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পাল্টে ফেলার চেষ্টা করে। এতে একদিকে ধারাবাহিকতার অভাবে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং অপরদিকে শিক্ষকদের কাজ বাড়ে। ফলে অনেক ভালো পদক্ষেপেরও সুফল পাওয়া যায় না। সাম্প্রতিক সময়ে গ্রেডিং পদ্ধতির পরিবর্তন তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে সমস্যার মূলে না গিয়ে বাহ্যিক কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর কোনো উপকার তো হয়ইনি, বরং সমস্যা আরো বেড়েছে। শিক্ষায় যেকোনো পরিবর্ধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন কর্মকাণ্ড গবেষণালব্ধ তথ্য ও উপাত্ত নির্ভর হওয়া উচিত।

৮. শিক্ষাকে রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে না দেওয়া। অতীতে রাজনৈতিক সরকারগুলো শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে তাদের দলীয় ধ্যান-ধারণা এবং মতাদর্শ শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। অথচ জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য কখনোই দলীয় মতাদর্শ প্রচার করা নয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হলো ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উৎকর্ষ সাধনের জন্য মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও মননশীলতার উন্নয়ন। কাজেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে কোনোভাবেই কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষায় ব্যবহৃত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. শিক্ষা সম্পর্কে জনমনে বিদ্যমান বিভ্রান্তি দূর করা ও সঠিক ধারণার প্রচার। শিক্ষাবিষয়ক কিছু মৌলিক ধারণা সম্পর্কে জনমনে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে এবং সেগুলোকে জনগণের সামনে সঠিকভাবে তুলে ধরা। বিভ্রান্তি দূর করতে নানা কলাকৌশল অবলম্বন করা। একমুখী শিক্ষার ধারণাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। আমরা মনে করি, একমুখী শিক্ষার ধারণাটি হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিক যে ধারা বা প্রতিষ্ঠানেই পড়াশোনা করুক না কেন, সবারই মন ও মনন গড়ে উঠবে আমাদের রাষ্ট্রীয় দর্শন, আদর্শ ও নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও আনুগত্যের ভিত্তিতে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখাকে একত্র করে শেখানোকে একমুখী শিক্ষা বলে না। এ ধরনের আরো অনেক ধারণা আছে, যেগুলোকে দূর করা জরুরি।

আজ দেশের প্রত্যেক নাগরিকের প্রাণের দাবি একটি বৈষম্যমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা। আমরা আশা করব, শিগগিরই আমাদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার বিনির্মাণে কাজ শুরু করবে এবং নিবন্ধের আলোচ্য বিষয়গুলো গুরুত্বসহ বিবেচনা করবে। আমরা ভবিষ্যতে উপরোক্ত সুপারিশ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন নিবন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার আশা রাখছি। তরুণদের রক্তে রঞ্জিত আমাদের দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তি তখনই অর্থবহ হয়ে উঠবে, যখন আমরা একটি গণমুখী ও জীবন-জীবিকামুখী বাস্তবসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

বিপ্লবী ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে সুযোগ আমাদের হাতে এসেছে, তাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের পাশাপাশি শিক্ষাব্যবস্থা বিনির্মাণ করতে হবে। তবেই না বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে। আমরা আশা করছি, জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে শহীদদের আত্মত্যাগকে অর্থবহ করতে এবং দেশের গণদাবিকে বাস্তবায়িত করতে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও কর্মমুখী করে নবপ্রজন্মের শিক্ষার্থীদের হতাশা থেকে মুক্তি দেবে। আমরা সেই কাঙ্ক্ষিত বিনির্মাণের প্রত্যাশায় রইলাম।

লেখকবৃন্দ : ড. মাহরুফ চৌধুরী (ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য), ড. তানভীর আহমেদ (কোভেন্ট্রি ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য), ড. মো. সাজেদুর রহমান (ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য) ও ড. এ টি এম শাফিউল আলম (কুইন মেরি ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, যুক্তরাজ্য)